সাহিত্য বিচিত্রা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI of Junior High and Senior High Schools ; Vide Boards' Notification No. TB/74/VI TB/198 dated 24. 11. 75

সাহিত্য বিচিত্রা

[প্রথম ভাগ]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

শ্রীজয়দেবকুমার পাল, বি. এস্‌-সি., এম্‌. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, দফরপুর প্রবর্তক বিদ্যামন্দির
দফরপুর, হাওড়া
কর্তৃক সঙ্কলিত

সম্পাদনা-সহায়ক
স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক
শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ., বি. টি.

গ্রন্থপীঠ
২০৯-বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
কোরক বন্দ্যোপাধ্যায়
২০৯বি বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ
মার্চ ১৯৭৭
তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৮১

মূল্য—দুই টাকা পঁচাত্তর পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীমনোজকুমার চাকী
লিপি মুদ্রণ
৪নং হাজী জ্যাকেরিয়া লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

॥ গদ্যাংশ ॥

॥ পদ্যাংশ ॥



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ শকুন্তলা ॥

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল-তমাল, পাহাড়-পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখী, কত টিয়াপাখীর ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের ক্ষেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ুর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা-গৌতমী ছিলেন। তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরণে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিসেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত?—

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই, ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল, তাতে গাই-বাছুর চরে বেড়াত। বনে ছায়া ছিল, তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা-গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধকথা, তাত কণ্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলি ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মাণিক—ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে চলে গেল। বনের পাখীরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারারাত বসে রইল।

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়াতে গিয়েছিল। তারা আমলকীর বনে আমলকী, হরীতকীর বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে। তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখীদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা

মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কণ্বের কাছে নিয়ে এল। তখনই সেই-সঙ্গে বনের কত পাখী, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল। তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল, তখন তাত কণ্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন। শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল, তারা আপনার হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা-গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাই বাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন কি বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই আপনার দুই প্রিয় সখী অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা। আর ছিল একটি মা-হারা হরিণশিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথিসেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ। আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবী লতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবী লতায় ফুল ফুটবে, সেইদিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ ছাড়া আর কি কাজ ছিল ?—হরিণ-শিশুর মতো নির্ভয়ে এ-বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন্-গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো ; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা, —এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে ব'লে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।

॥ দুষ্মন্ত ॥

যে- দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম দুষ্মন্ত।

সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পূব দেশের রাজা, পশ্চিম দেশের রাজা, উত্তর দেশের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত-সমুদ্র তের-নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা, রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়ি-খানায় কত সোনা-রুপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস-দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয়সখা ছিল।

যেদিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেদিন সাত সমুদ্র তের-নদীর রাজা—রাজা দুষ্মন্ত—প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরীব ব্রাহ্মণ রাজ-বাড়িতে রাজার হালে থাকে, দুবেলা থাল থাল লুচি, মণ্ডা, ভার ভার ক্ষীর-দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কি, রাজার আজ্ঞা।

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল,

জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দুপাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হট্ হট্ ক'রে চললেন।

ক্রমে রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্যসামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনেসাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখী, কত পাখীর ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল, ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া খেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে ক'রে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন ক'রে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখী, কত বরা, কত বাঘ; কত ভালুক, কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমীর জল দিয়ে, আকাশের পাখী আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখীর সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখী লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল ; আর শকুন্তলা, অনসূয়া ; প্রিয়ংবদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুন্-গুন্ গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারো হিংসা করে না। মহাযোগী কণ্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়। হরিণ-শিশু ও সিংহশাবক একবনে খেলা করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—উর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও ধনুঃশর ফেলে ঋষি-দর্শনে চললেন।

* * * *

এদিকে মাধব্য কি বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ-বন সে বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক সময় রাজভোগ না

পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়? বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে। সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়—ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারে-খারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজা রাজ্যে ফিরলেন না, মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্তের সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

অনুশীলনী

১। কণ্বমুনির আশ্রমের বর্ণনা দাও।

২। শকুন্তলাকে কিভাবে পাওয়া গিয়াছিল তাহার বর্ণনা দাও।

৩। শকুন্তলার সঙ্গে তপোবনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

৪। তপোবনে শকুন্তলা ও তাঁহার দুই প্রিয়সখীর কাজ কি ছিল তাহা বর্ণনা কর।

৫। রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়া বর্ণনা কর।

এখানে ঋষি কণ্বদেবের জীবনযাত্রা প্রকৃতির দৃশ্য, শকুন্তলার শৈশব জীবন এবং পরে রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার সাক্ষাৎ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।



স্বামী বিবেকানন্দ

অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতী মাল্যধারিণী বাংলাদেশের একটি রূপ আছে। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ না করলে সে বোঝা যায় না। সেই নীল আকাশ, তার কোলে কোলে মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার! তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল, নারিকেল, খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেলছে। তার নীচে ফিকে ঘন, ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশান ইত্যাদি হরেক রকমের সবুজের কাঁড়ি-ঢালা আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল—পাতায় পাতা—গাছ, ডাল-পালা আর দেখা যাচ্ছে না! আশ-পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ, হেলছে-দুলছে আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী, ইরানী, তুর্কিস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস! যতদূর চাও, সেই শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটেছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে—জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস। গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা

দিচ্ছে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথা'র উপর পর্যন্ত একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা—রঙের এত রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি?—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে! বলি,—এইবেলা গঙ্গামা'র শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাক্‌ছে না, দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইঁটের পাঁজা, আর নামবে ইঁটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাটবোঝাই ফ্লাট, আর সেই গাধাবোট। আর ঐ তাল আর লিচুর রং, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার—ওসব কি আর দেখ্‌তে পাবে! দেখবে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত অস্পষ্ট কলের চিমনি।

জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। এইখানে ধলায়-কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—ঘন নীল জল তরঙ্গায়িত, ফেনিল—বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচচে। পিছনে আমাদের গঙ্গাজল। সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে! …ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল! এবারে খালি নীলাম্বু, সামনে-পিছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল। খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গশোভা, নীল পট্টবাস পরিধানে। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল, আজ তাদের

সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়—পবনদেব সাথী। মহা গর্জন, বিরাট হুঙ্কার—ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েছে। তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত।

উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমুতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকূলের লম্ফঝম্ফ গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট সম্মিলন। তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়ে এসব শুন্‌ছি, সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ ক'রে স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ—'রুল্ ব্রিটানিয়া, রুল দি ওয়েভ্‌স্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো। চমকে চেয়ে দেখি —জাহাজ বেজায় দুল্‌ছে, আর তু—ভায়া দু'হাত দিয়ে মাথাটি ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

সেকেণ্ড ক্লাসে দুটি বাঙালী ছেলে পড়্‌তে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়েও খারাপ। একটি ত' এমনি ভয় পেয়েছে যে বোধ হয়, তীরে নামতে পারলে এক ছুটে চোঁ-চা দেশের দিকে দৌড়ায়!

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্ছে। একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার বর্ষাকাল, মনসুনের সময়; জাহাজ খুব হেলতে-দুলতে যাচ্ছেন। তবে এই ত' আরম্ভ, পরে বা কি আছে। [সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

১। ডায়মণ্ডহারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় প্রবেশ করলে গঙ্গার যে শোভা চোখে পড়ে তাহা বর্ণনা কর।

২। "বলি,—এইবেলা গঙ্গামা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও।"—স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা হইতে লণ্ডনে যাত্রাকালে এরূপ মন্তব্য কেন করেন, তাহা বুঝাইয়া দাও।

৩। বর্ষায় সমুদ্র-জাহাজের কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা বর্ণনা কর।



মানুষ দেবতা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ছোট একখানি ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রদীপের সামনে জনৈক ব্রাহ্মণ। তিনি একমনে একখানি পুঁথি পড়িতেছেন।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। হঠাৎ খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল, দরজা খুলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ মুখ তুলিয়া কহিলেন, "কে, রে?"

"কর্তা, আমি!" বলিয়া আলোর সামনে একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি চাই? ভিতরে আয়।"—ব্রাহ্মণ তাহাকে আহ্বান করিলেন।

সাহস পাইয়া লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঢিপ্ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া গেল এবং ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন! কহিলেন,—"কি রে? ব্যাপার কি? কাঁদছিস কেন?"

লোকটি কহিল,—"আমায় বাঁচান কর্তা, আমার যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! কেউ যে আমায় দয়া করছে না!"

লোকটির চোখে জল দেখিয়া ব্রাহ্মণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"কি হয়েছে খুলেই বল্ না! কে তুই? কোথায় থাকিস?"

সে কহিল—"বাবা! আমি একজন ঝাড়ুদার। আমার স্ত্রীর কলেরা হয়েছে, কিন্তু ডাক্তার বৈদ্য কেউ আমার ঘরে যেতেই চায় না। আমি ছোটজাত,—মেথর। আমাকে ছুঁলে নাকি জাত যাবে। জাতের ভয়ে কেউ এসে আমায় সাহায্য করছে না, কি আমি করবো তার কোন উপায়ও কেউ আমায় বাত্লে দিচ্ছে না। আমি এখন কি করবো বাবা ঠাকুর?"

কালো পাথরের উপর ঝর্ণার ধারা যেমন করিয়া নামিয়া আসে; ঝাড়ুদারের দু'চোখ বহিয়া ঠিক তেমনি ভাবে জলধারা নামিল।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তারপর কহিলেন,—"কি করবি? আচ্ছা নে; আমার লণ্ঠনটা নে দেখি। আমি ওষুধের বাক্সটা নিচ্ছি। তারপর চল্, তোর বাড়ী কোথায়, নিয়ে চল্।"

লোকটি লণ্ঠন হাতে আগে আগে চলিল, আর ব্রাহ্মণ একটি ছোট বাক্স হাতে তাহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন।

মেথরের স্ত্রী তখন মর-মর। তাহার সারা গা ভেদবমিতে মাখা, ঘরে বিষম দুর্গন্ধ। দেখিয়া ঝাড়ুদার বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রথমে লোকটির সাহায্যে রোগীর ঘরটি পরিষ্কার করিলেন—তারপর রোগিনীকে ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন।

সারারাত রোগিনীর সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! অনররত ভেদ ও বমিতে সে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ একমনে তাহার সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহা একেবারে যমের সঙ্গে লড়াই। লড়াইয়ে হার মানিয়া যমরাজা ফিরিয়া গেলেন, প্রায় ভোরবেলায় রোগিনী অনেকটা সুস্থ হইল।

রোগিনীকে আরও একটু সুস্থ দেখিয়া ব্রাহ্মণ অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণের সেবাযত্নে অসহায় ঝাড়ুদারের স্ত্রী ভাল হইয়া উঠিল।

পরদিন ব্রাহ্মণের বাড়িতে মনের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়া ঝাড়ুদারটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে কহিল,—"বাবা ঠাকুর! আপনি কি মানুষ না দেবতা? এই কার্মাটার শহরে একটা লোক আমার দিকে ফিরেও চায় নি, আপনারই দয়ায় আমি আমার স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছি। একটা মেথরের স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ কি কখনো এমন কাজ করতে পারে? আমি বড় কাঙ্গাল। আপনার দয়ার বদলে আমি কি দিতে পারি? কে আপনি—?"

শুনিয়া হয়তো অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবে—কে তিনি? কে এই ব্রাহ্মণ?

এই ব্রাহ্মণের নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি কেবল বিদ্যারই সাগর ছিলেন না, দয়ার সাগর বলিয়াও তিনি বিখ্যাত। সাগর বা সমুদ্রের জল যেমন অফুরন্ত; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যা এবং দয়া দুই-ই ছিল তেমনই অফুরন্ত।

কেহ বিপদে পড়িলে, তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। তিনি তখন একবারও ভাবিতেন না, লোকটি ধনী কি দরিদ্র, পাপী কি ধর্মভীরু, ব্রাহ্মণ কি মেথর!

রচনাটি থেকে আমরা পাই যে— প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিভাবে সামাজিক কুসংস্কার উপেক্ষা করে অস্পৃশ্য অবহেলিত মেথরের মুমূর্ষু স্ত্রীকে সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এই রচনা পাঠ করে ছাত্ররা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে জাতিভেদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে।

অনুশীলনী

১। ঝাড়ুদারের স্ত্রীর কলেরা হইলে কেহ তাহার সাহায্যের জন্য আগাইয়া যায় নাই কেন?

২। ঝাড়ুদারের বিপদে কাহার মনে সহানুভূতি জাগিয়াছিল?

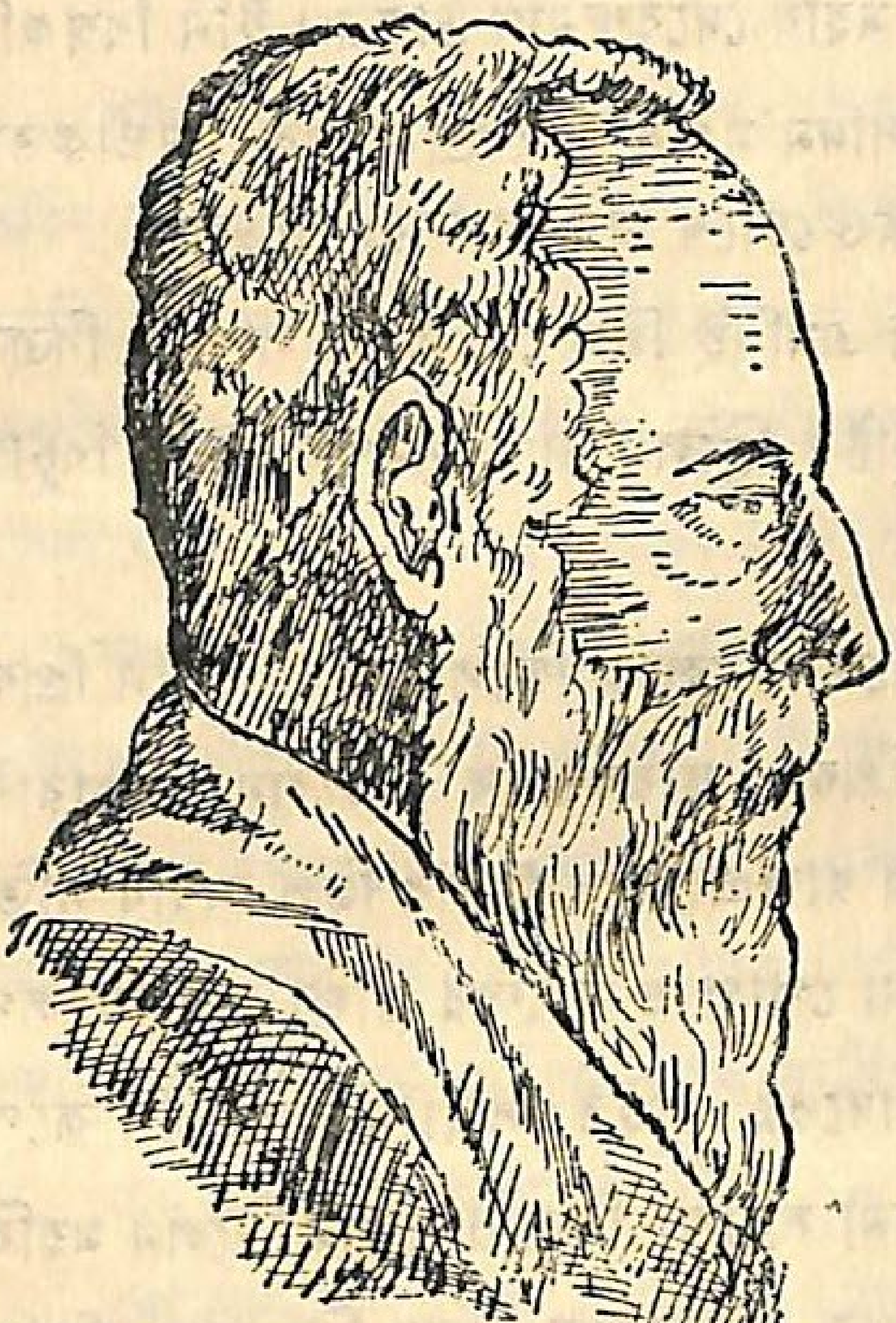
৩। কিভাবে তাঁহার সেবায় ঝাড়ুদারের স্ত্রী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা দাও।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি শুধু বিদ্যারই সাগর ছিলেন?

৫। কোন্ গুণে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা বল।

———

ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালী



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

"যেভাবেই হৌক পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবেই। ঋণ-শোধ করিতে গিয়া যদি পথের ভিখারী হইতে হয়, সেও ভাল। তবু অধর্ম করিয়া পাওনাদার-গণকে ঠকাইতে পারিব না। অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াও যদি ঋণশোধ সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ট্রাস্ট্ সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিব। আমাদিগকে ঋণমুক্ত হইতে হইবে।"—কনিষ্ঠ সহোদরকে ডাকিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা পাওনাদারদের সম্মুখেই এই কয়টি কথা বলিলেন। পাওনাদারেরা সকলেই একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহারা কেহই ত' এইরূপ আশা করেন নাই। এই ত' কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজার সাহেব জানাইয়া দিয়াছেন, আইনতঃ ট্রাস্ট্ সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। আর কর্তা নিজেই কিনা বলিলেন যে, ঋণমুক্ত হইবার জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রয় করিয়া দিবেন। সাবাস। অপূর্ব সাধুতা বটে।

এই ধর্মাত্মা পুরুষটির নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মভীরুতায় ও মহাপ্রাণতায় কাহারও কাহারও চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দেবেন্দ্রনাথের মনের দৃঢ়তা এমনিই ছিল যে, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও পিতৃঋণ শোধ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হওয়া তাঁহার প্রকৃতি ছিল না।

সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ যেমন তেমন লোক ছিলেন না। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহপুষ্ট—ইংলণ্ডের রাজপ্রাসাদে যাঁহার ছিল অবাধ গতি, রোমের প্রধান ধর্মযাজক মহামান্য পোপ ও ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ পর্যন্ত যাঁহাকে রাজোচিত সমাদরের সহিত সম্মানিত অতিথি রূপে গ্রহণ করিতেন, তেমন এক ধনী সম্ভ্রান্ত পিতার সন্তান ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে দেখা গিয়েছিল, তিনি প্রায় কোটি টাকার ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। নিজের ঐশ্বর্যে ও বিলাসিতায় সকলকে বিস্মিত করিতে গিয়া তাঁহার এই ঋণ হইয়াছিল।

সত্য কথা যে, দ্বারকানাথ কোটি টাকার মত ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুচতুর ব্যক্তি। পাছে ঋণের দায়ে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়, পরিবারবর্গ বিপন্ন হয় এই আশঙ্কায় তিনি কতকগুলি প্রধান প্রধান জমিদারী 'ট্রাস্ট্ সম্পত্তি, করিয়া যান। আইনতঃ ঐ ট্রাস্ট্ সম্পত্তিতে কাহারও হাত দেওয়ার অধিকার থাকে না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার পিতার ঋণের কথা শুনিলেন, তখন ঋণ পরিশোধের জন্য ট্রাস্ট্ সম্পত্তিসহ যাবতীয় জমিদারী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাকে তাহা করিতে হয় নাই।

পাওনাদারেরা দেবেন্দ্রনাথের সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই। সেই সম্পত্তিকে তাঁহারা শুধু নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং ক্রমশ যাহাতে ঋণের টাকাটা শোধ হইয়া যায়, তাহার একটা ব্যবস্থা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথের পরিবার পরিজনদিগের সংসারের ব্যয়ের নিমিত্ত একটা বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন।

অতঃপর যে পরিবার এককালে রাজার হালে থাকিত, তাহা তখন হইতে গরীবী হালে দিনযাপন করিতে লাগিল।

কিন্তু পিতার ঋণ শোধ করার একটা উপায় হইয়াছে দেখিয়া, আর অসত্য ও অধর্মের পথ অবলম্বন করিতে হয় নাই দেখিয়া, সেদিন দেবেন্দ্রনাথের মনে অসীম শান্তি নামিয়া আসিয়াছিল।

এইভাবে তুই বছর কাটিল।

দেবেন্দ্রনাথ খুবই সাদাসিধা ভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। ধনীর ঘরের ছেলেকে সাধারণ মানুষের মত দিনযাপন করিতে দেখিয়া, কিছুদিন বাদেই পাওনাদারেরা সকল সম্পত্তির ভার দেবেন্দ্রনাথকেই ফিরাইয়া দিলেন। ঠিক হইল, অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ নিজেই সব দেখিবেন, আর ক্রমশ দেনা শোধ করিবেন। সাধুতার গুণে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয় ফিরিয়া পাইলেন এবং সংসারের সমস্ত খরচ কমাইয়া ধীরে ধীরে দেনা শোধ করিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তখন বড় কষ্টে দিন কাটাইতেছেন। জমিদারীর যাহা আয়, তাহার প্রায় সবটুকুই পিতৃঋণ শোধ করার জন্য পাওনাদারগণের হাতে তুলিয়া দিতে হইতেছে। সব দেনা তখনও শোধ হয় নাই। তখনও প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা দেনা শোধ করা বাকি। এমনি সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পিতা আমাদের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিবেন বলিয়া

প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু সে টাকা তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই। আপনি যদি এখন সেই টাকাটা আমাদের দান করেন, তবে বিশেষ উপকার করা হয় আমাদের সমিতির।”

দেনা শোধ করিতে দেবেন্দ্রনাথ তখন বড়ই বিব্রত। সংসারের অনেক রকম খরচ কমাইয়া গরীবী চালে তাঁহার দিন তখন কাটিতেছে। দান করার মত অবস্থা তখন তাঁহার নয়। তা ছাড়া, পিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া দানের টাকাটা তখন তিনি না দিলেও পারিতেন। না দিলে, কেহ তাঁহাকে অপরাধীও করিতে পারিত না।

কিন্তু পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন জানিয়া দেবেন্দ্রনাথ উহাকে পিতৃঋণ বলিয়াই ধরিয়া লইলেন এবং ধীরে ধীরে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার দেনার সঙ্গে ঐ এক লক্ষ টাকার দানও সুদ সমেত দিয়া দিলেন।

চল্লিশ বৎসরে দেবেন্দ্রনাথ সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঐশ্বর্য-বিরাগী। সংসারে থাকিতে হইলে মানুষকে যাহা কিছু করিতে হয়, সবই তিনি করিতেন। বিষয়কর্ম তিনি সবই দেখিতেন। না দেখিলে, ঐ লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ শোধ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু তিনি বিষয়ের দাস ছিলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ একদিন তাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধের জন্য যে পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন, সে পথ বড়ই কঠিন। কিন্তু কঠিন হইলেও যে পথ ধর্মের পথ, যাহা সাধুতার পথ, তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন নাই।

অনুশীলনী

১। পিতার ঋণ শোধ করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন্ পথ অবলম্বন করেন, তাহা বল।

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা কে ছিলেন ? তাঁহার নাম বল।

৩। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র বর্ণনা কর।



মীরাবাঈ

পোঁ পোঁ পোঁ পোঁ ডুম্‌ডুম্‌ ডুম্‌ডুম্‌।

বেজে উঠল শানাই। বেজে উঠল ঢাক-ঢোল। আরো কত বাজনা। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল—বর আসছে। বর আসছে। আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে আসছে বরযাত্রীর মিছিল।

রাজপুতানার মাড়োয়ারের একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজপ্রাসাদে চঞ্চল হয়ে উঠল পাঁচ বছর বয়সের একটি ছোট্ট মেয়ে মীরাবাঈ।

রাণা রতনসিংহের মেয়ে মীরাবাঈ। কৌতূহলের সঙ্গে ছুটে গেল প্রাসাদ-অলিন্দে। উৎসুক চোখ দুটি তুলে দেখতে লাগল মিছিলের সমারোহ।

দেখতে দেখতে ফুলের সাজে সাজানো বরের গাড়ী এসে পড়ল।

বাঃ, কী সুন্দর বর। কপালে চন্দন, মাথায় মুকুট, পরণে পীতাম্বর। মীরার মা-ও দাঁড়িয়েছিলেন মেয়ের পাশে। মীরা মাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ, মা আমার বর কই ?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে মা হাসলেন। বললেন, আরো বড় হও মা, তখন তোমার বর আসবে।

মার জবাবে মেয়ে খুসী হল না। বায়না ধরলে, এখুনি আমার বর চাই।

মা যখন কিছুতেই মেয়েকে শান্ত করতে পারলেন না, তখন কালো পাথরের একটি ছোট্ট কৃষ্ণমূর্তি এনে তুলে দিলেন মেয়ের হাতে। বললেন, এই তোমার বর।

এই বর ? বাঃ, কী সুন্দর কালো। কী ঢলঢল মুখ। হাতে আবার বাঁশি, মাথায় শিখীপাখা। পরণে পীতাম্বর—বিয়ের মিছিলের সেই বরটির মতোই ত' বটে।

বর পেয়ে মীরা ভারী খুশী। সারাদিন ধরে বরকে নিজের হাতে স্নান করায়, খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম পাড়ায়, আর গুন্‌গুন্ করে কত গান শোনায়।

অপূর্ব কণ্ঠ তার, গান তার যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়।

মীরা রূপেই বা কী কম ? অমন রূপ বড় বড় রাজার ঘরেও দেখা যায় না। দশটা রাজ্য খুঁজলেও অমন রূপ চোখে পড়ে না।

মীরা দিন দিন বড় হয়, আর রূপের খ্যাতি তার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই খ্যাতির স্তুতি পৌঁছয় চিতোরের রাণার কানে। তিনি দূত পাঠালেন রতনসিংহের কাছে—মীরাকে পুত্রবধূ করবার সম্মতি চেয়ে।

চিতৌরের যুবরাজের বউ হবে রতনসিংহের মেয়ে! রতনসিংহ

যেন আকাশের চাঁদ পেলেন হাতের মুঠোয়। তিনি সানন্দে চিতোর রাণার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

তারপর একদিন অনেক বাঁশি বাজল, অনেক আলো জ্বলল, অনেক বাজী পুড়ল, আর শুভলগ্নে চিতোরের যুবরাজ ভোজের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মীরাবাঈ-এর। কিছুদিন পরেই চিতোর-রাণার মৃত্যুতে ভোজদেব হলেন রাণা, আর মীরাবাঈ হলেন রাণী।

কিন্তু রাণীর শত ঐশ্বর্যও মীরার মনকে ভোলাতে পারলে না। সেই ছেলেবেলায় গভীর বিশ্বাসে যাঁকে বর বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, এখনো মীরাবাঈ তাঁকেই মনে করতে লাগলেন তাঁর স্বামী বলেই। লৌকিক বিয়ের স্বামীকে ভাবতে পারলেন না 'বর' বলে। দিনরাত তিনি মগ্ন হয়ে থাকেন কৃষ্ণের চিন্তায়, কৃষ্ণের সেবায়।

চিতোরের রাণারা ছিলেন শাক্ত। মহাশক্তি দুর্গার পূজারী ছিলেন তাঁরা। তাই মীরার শাশুড়ী আর ননদ প্রীতির চোখে দেখতে পারলেন না মীরার কৃষ্ণপূজা। তাঁরা মীরাকে দুর্গাভক্ত করে তোলবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন রেগে গিয়ে মীরার বিরুদ্ধে রটিয়ে দিলেন নিন্দা।

কুৎসা বাতাসের আগে ছোটে। শীঘ্রই রাণা ভোজের কানে উঠল সেই নিন্দার কথাটা। তখন গভীর রাত। রাগে অন্ধ হয়ে তখুনি ছুটলেন মীরাকে হত্যা করতে। মীরা তখন মন্দিরে— শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মেতে আছেন।

রাণা ভোজ মন্দিরের বন্ধ দরজায় কান পেতে শুনলেন মৃদু নূপুর-গুঞ্জন। লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেললেন তিনি। দেখলেন, কোথাও কেউ নেই, কেবল কৃষ্ণের মূর্তির সমুখে মীরা ধ্যানমগ্না হয়ে বসে আছেন, তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। এই অপূর্ব দৃশ্যে ভোজের ভুল ভাঙল। তাঁর

মনে হ'ল—মীরাবাঈ একজন সত্যকারের ধর্মপ্রাণা সাধিকা। তখন তিনি মীরার জন্যে বিরাট একটি নতুন মন্দির তৈরি করলেন আর মীরাকে স্বাধীনতা দিলেন, সেই মন্দিরে ইচ্ছামতো সাধন-ভজন করবার জন্যে।

মীরার এই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সব চেয়ে বেশী প্রচারিত হল তাঁর মিঠে গলার অতুলনীয় ভজন-গানের কথা।

আকবর তখন দিল্লীর সম্রাট। তাঁর অন্যতম সভাসদ তানসেন ছিলেন ভারতবিখ্যাত গাইয়ে। তাঁদের দু'জনেরই সাধ হ'ল—মীরার ভজন শুনবেন। কিন্তু বাধা বিস্তর। সেই সময়ে চিতোরের রাণা ও দিল্লীর সম্রাটদের মধ্যে চলছিল ভীষণ বিরোধ। তাই ছদ্মবেশে তাঁরা এলেন মীরার ভজন শুনতে।

ভজন শুনে আকবর খুব খুশী হলেন এবং সাদা ধবধবে একটি বহুমূল্য মুক্তার হার সমর্পণ করলেন 'গিরিধারীলালে'র শ্রীচরণে।

একদিন ভোজ দেখতে পেলেন সেই হারটি,—হার দেখেই চিনতে পারলেন যে, সেটি আকবরের হার। চিনতে পেরে তিরস্কার করলেন মীরাকে। বললেন—'মোগল বাদশাহের গলার হার তুমি নিয়েছ; তোমার মুখ আমি আর দেখব না।"

রাণার আদেশ শিরোধার্য করে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে রাজপুরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মীরা। নানা তীর্থে ঘুরে পৌছলেন বৃন্দাবনে। সেখানেই তাঁর বড় আদরের শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কাটতে লাগল তাঁর দিনগুলি।

দিন যায়। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য জন্মাষ্টমী তিথি। মীরা বসে রয়েছেন একটি মন্দিরের মধ্যে। ভিতর থেকে মন্দিরের দরজা বন্ধ।

সারাদিনের পরেও যখন মন্দিরের দরজা খুলল না, তখন ভক্তরা দরজা ভেঙে ফেললেন। দেখা গেল, মীরাবাঈ সেখানে নেই, শুধু

ওড়নাখানি দিয়ে ঢাকা রয়েছে গিরিধারীলালের মূর্তি। ভক্তরা বুঝলেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছেন মীরাবাঈ।

মীরাবাঈ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছেন। তিনি নেই—কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর অপূর্ব ভজন গানগুলো। সেগুলোর ভাষা যেমন মনোহর, ভাবও তেমনি সুন্দর। ঐ গানই ছিল তাঁর পূজার মন্ত্র।

অনুশীলনী

১। শৈশবে মীরাবাঈ 'বর চাই' বলিয়া বায়না ধরায়, তাঁহার মা কিভাবে তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহা বল।

২। মীরাবাঈয়ের বিবাহ হয় কাহার সঙ্গে?

৩। বিবাহের পরেও কাহার চিন্তা ও সেবায় মীরাবাঈয়ের দিন কাটিত তাহা বল।

৪। মীরার নিন্দা শুনিয়া রাণা ভোজ কি করিয়াছিলেন?

৫। মীরার মন্দিরের বন্ধ দরজায় কান পাতিয়া রাজা ভোজ কি শুনিয়াছিলেন?

৬। মীরার মন্দিরের দরজা ভাঙিয়া রাজা ভোজ কি দেখিতে পান?

৭। দিল্লীর সম্রাট আকবরের সভায় বিখ্যাত গায়ক কে ছিলেন?

৮। আকবর এবং তানসেন ছদ্মবেশে চিতোরে আসেন কেন?

৯। মীরাবাঈ পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন কি জন্য?

রচনাটিতে মীরাবাঈয়ের অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।



অসাধু আচরণ করিবনা

একটি ছোট ছেলে। সেই বৎসরেই ছেলেটি প্রথম ইস্কুলে ভর্তি হইয়াছে। ছেলেটি তাহার ক্লাশে বসিয়া আছে। ক্লাশে পড়াশুনা হইতেছে।

শুনা গেল, একটি সাহেব ইস্কুলের পড়াশুনা কেমন হয় তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। এখনই তিনি এক এক করিয়া সকল ক্লাশেই ঘুরিবেন।

এই কারণে শিক্ষক মহাশয় ভাল ভাল কয়েকজন ছেলেকে প্রথম বেঞ্চিতে আনিয়া বসাইলেন। পড়া জিজ্ঞাসা করিলে ভুল উত্তর দিবার মত ছেলে উহাদের একজনও নয়। উহাদের মধ্যে নূতন ভর্তি হওয়া ছেলেটিও একজন।

যথাসময়ে সাহেব ক্লাশে আসিলেন এবং ছেলেদের কয়েকটি

ইংরাজী শব্দের বানান লিখিতে বলিলেন। শব্দ কয়টির বানান ক্লাশের ঐ নূতন ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই ঠিক লিখিল। শিক্ষক মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন। লক্ষ্য করিয়া তিনি ইসারায় ছেলেটিকে জানাইতে চেষ্টা করিলেন যে সে একটি শব্দের বানান ভুল লিখিয়াছে।

শিক্ষক মহাশয় এমন ইঙ্গিতও করিলেন—পাশের ছেলের শ্লেট দেখিয়া বানানটি শুদ্ধ করিয়া লও। ছেলেটি কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল না। সে ইঙ্গিত বোঝার মত ছেলে ছিল না। কারণ, যে বালক কোনদিন নকল করে নাই, সে কি নকল করার ইঙ্গিত বুঝিতে পারে? বরং ঐ বালক সরল মনে ইহাই বুঝিল যে—শিক্ষক মহাশয় তাহাকে সাবধান করিতেছেন, সে যেন পাশের ছেলেটির শ্লেট দেখিয়া নকল না করে।

ফলে দেখা গেল, অন্যান্য সব ছেলের বানান ঠিক হইল। কিন্তু এই নূতন ছেলেটির একটি বানান ভুল হইল। সাহেব সকলকার বানান দেখিয়া চলিয়া যাইবার পর শিক্ষক মহাশয় নূতন ছেলেটিকে বলিলেন, "তুমি আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলে না?"

ছেলেটি এবার সব বুঝিল। কিন্তু বুঝিয়াও সে খুশী হইল এই ভাবিয়া যে, যাক্, সে তাহা হইলে নকল করিয়া বাহাদুরী লয় নাই। শুধু সেদিন নহে, ইহার পরেও এই ছেলেটির মনে কোনদিন পাশের ছেলের খাতা বা শ্লেট দেখিয়া নকল করার প্রবৃত্তি হয় নাই। অপর কাহাকেও নকল করিয়া এই বালক চলিতে শিখে নাই।

কে এই ছেলেটি যিনি সেদিন নকল করিয়া সাহেবের প্রশংসা পাইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নকল করিবার কথা মনের কোণেও স্থান দেন নাই? ইনি হইতেছেন মহাত্মা গান্ধী। ছেলেবেলা হইতে যে পথে অন্যায়, যে পথে অধর্ম সে পথে চলিতে তাঁহার মন বিদ্রোহ

করিত। আজীবন তিনি সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিয়াছিলেন। তিনি চিরদিনই ছিলেন স্বাধীনচেতা। আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার মত শক্তি তাঁহার ছিল। তাই দেশবাসী তাঁহাকে 'মহাত্মা' এই নাম দিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। ইস্কুলে শিক্ষক মহাশয় ভাল ভাল কয়েকজন ছেলেকে প্রথম বেঞ্চিতে আনিয়া বসাইয়াছিলেন কেন?

২। ইস্কুলে পড়াশুনা কেমন হইতেছে তাহা নিরূপণ করিবার জন্য সাহেব ক্লাশে ঢুকিয়া কি করিয়াছিলেন?

৩। 'তুমি আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলে না?'—একথা কে বলিয়াছিলেন?

৪। এই ইঙ্গিতটি কি ছিল?

৫। বালক মহাত্মা গান্ধী শিক্ষক মহাশয়ের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন নাই কেন?

৬। দেশবাসী গান্ধীকে 'মহাত্মা' এই নাম দিয়াছিল কেন?

শ্যেন কপোতের উপাখ্যান



দূর অতীতের কথা। শিবি নামে এক রাজ্য ছিল। উশীনর ছিলেন সে রাজ্যের রাজা। তাঁর দয়া ও দানধর্মের তুলনা মেলা ভার।

রাজা উশীনর কত বড় ধার্মিক আর দাতা, তা পরীক্ষা করবার জন্যে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিদেবতাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন। অগ্নিদেব কপোতের রূপ ধরলেন। ইন্দ্র ধরলেন বাজপাখীর রূপ।

সেদিন রাজা উশীনর বসে আছেন তাঁর রাজসভায়। এমন সময় কোথা থেকে একটি কপোত উড়ে এসে তাঁর দক্ষিণ উরুর ওপর বসল। সঙ্গে সঙ্গেই তীরবেগে নেমে এল একটি বাজপাখী।

রাজা কপোতটিকে আশ্রয় দিলেন। তা দেখে, বাজপাখী বলল, "মহারাজ! কপোত আমার খাদ্য। আপনি ওকে ছেড়ে দিন, আমি আমার ক্ষুধা মেটাই।"

কপোতটিও বলল, "দোহাই মহারাজ। আমি আপনার শরণ নিয়েছি। আমাকে আপনি বাজপাখীর মুখে তুলে দেবেন না।"

সব শুনে রাজা উশীনর বললেন, "কপোতটি ভয় পেয়ে আমার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রিতকে ত্যাগ করলে আমার অধর্ম হবে। কপোতটিকে আমি ত্যাগ করব না।"

রাজার কথা শুনে বাজপাখী বলল, "রাজন্। আমার ক্ষুধার খাদ্য ঐ কপোত। ক্ষুধার্তকে ক্ষুধার খাদ্য দিয়ে বাঁচানোও ত' আপনার উচিত।"

বাজপাখীর কথা শুনে রাজা উশীনর বললেন, "তোমার ক্ষুধার খাদ্য দিতে আমি বাধ্য। কিন্তু এই কপোতটি ছাড়া তুমি অন্য যে-কোনও জীবের মাংস চাও, বল। আমি তা তোমাকে দিতে পারি।"

এই কথায় বাজপাখী বলল "ওই কপোতটির ওপর আপনার যদি এত দয়া, তবে ওর সমপরিমাণ মাংস আপনি আপনার দেহ থেকে কেটে আমায় দিন।"

বাজপাখীর কথা শুনে উশীনর বললেন "বেশ তাই হবে।"

রাজার আদেশে সেই মুহূর্তেই একটি তুলাদণ্ড এল। পাখীটিকে তুলাদণ্ডের একদিকে চাপানো হল। অন্যদিকে রাজা তাঁর দেহ থেকে মাংস কেটে নিয়ে তুলাদণ্ডের আর একদিকে রাখলেন।

কিন্তু আশ্চর্য! রাজার দেহের মাংস কপোতের মাংসের চেয়ে হালকা বলে প্রমাণিত হল। যে দিকে কপোতটি বসে ছিল, সেই দিকটাই ঝুঁকে রইল।

রাজা উশীনর এর পর বার বার তাঁর দেহ থেকে মাংস কেটে তুলাদণ্ডে চাপাতে লাগলেন। কিন্তু তবু রাজদেহের মাংস কপোতের সমপরিমাণ হল না।

রাজসভায় সবাই অবাক। রাজা কিন্তু আদৌ চঞ্চল হলেন না। তিনি নিজেই শেষ পর্যন্ত তুলাদণ্ডের একদিকে চেপে বসলেন।

এ ব্যাপার দেখে ইন্দ্র ও অগ্নিদেব মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা তখন নিজেদের মূর্তি ধরলেন। উশীনরকে আশীর্বাদ করে ইন্দ্র বললেন, "রাজন্। আপনাকে পরীক্ষা করবার জন্যে আমরা এসেছিলাম। আশ্রিতকে রক্ষা করতে, ত্যাগের যে মহান আদর্শ আপনি দেখালেন পৃথিবীতে তা বিরল।"

তারপর ইন্দ্র ও অগ্নি স্বর্গে ফিরে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদে রাজা উশীনর আবার তাঁর পূর্ব দেহ ফিরে পেলেন।

* শরণাগতকে যে কোন মূল্যে আশ্রয় দেওয়া ধর্ম — উপাখ্যানটিতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১। রাজা উশীনর কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন ?

২। কিজন্য রাজা উশীনরের খ্যাতি ছিল ?

৩। ইন্দ্র ও অগ্নিদেবতা কি উপায়ে রাজা উশীনরের ধার্মিকতা ও দানধর্মের পরীক্ষা করেন তাহা বল।

৪। রাজা উশীনর যে মহান আদর্শ দেখাইয়া দেবতাদের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, উহা কিসের আদর্শ ?

উপাখ্যানটিতে দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশ নিয়ে উশীনরকে



মরণজয়ী বীর

প্রবোধকুমার সান্যাল

দুঃসাহসিক বীর যাঁরা, তাঁদের সম্বন্ধে গল্প শোনবার কৌতূহল কোনো যুগেই কম নয়। তাঁদের কাহিনী, তাঁদের অতিমানবিক অধ্যবসায় এবং বীরত্ব, দুর্গমকে করতলগত করার জন্য তাঁদের জীবন-জোড়া তপস্যা, এ সমস্তই যুগে যুগে এবং কালে কালে মানবজাতিকে নানাভাবে উপকৃত করেছে।

দুঃখজয়ী যাঁরা, দুঃসাধ্যকে জয় করার জন্য যাঁরা ছুটে গেছেন সেই-দিকে সাধারণ মানুষ যে পথে হাঁটে না। তাঁরা ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করেছেন, নূতন মানচিত্র সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের অভিযাত্রায়,—মানুষের চিন্তাধারায় তাঁরা এনে দিয়েছেন, নূতন বিষয়বস্তু। গহন অরণ্যে, দুরারোহ পর্বতমালায়, চিরতুষারময় রাজ্যে, পশুকঙ্কাল-পরিকীর্ণ নির্জ্জলা নিষ্ফলা মরুভূমিতে,—এবং আরো কত অগম্য-স্থানে নির্ভীক

বীরের দল হাসিমুখে চ'লে গেছেন। তাঁদের সেই যাত্রাপথের ইতিবৃত্ত যে মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে কত মণিমাণিক্য যুগিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ক্যাপ্টেন কুক্, লিভিংস্টোন, স্কট—এঁরা সকল যুগেই সম্মান লাভ করবেন সন্দেহ নেই। এঁরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে নূতন নূতন ইতিহাস রচনা করছেন, এঁদের বীর্য্যবত্তাকে মানুষের সমাজ সানন্দে স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

ইউরোপে গত যুগে যাঁরা বীরের কবচ-কুণ্ডল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে হেডিন্ হলেন প্রধান। পৃথিবীব্যাপী তাঁর সম্মান ও সমাদর। উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সুইডেনের স্টক্‌হল্‌মে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই হেডিন্ যেমন মানচিত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তেমনি তাঁর ভালো লাগত উত্তর মেরুলোকের ভ্রমণ-কাহিনী। বালকের মনের এই দুঃসহ ক্ষুধাই পরবর্ত্তীকালে তাঁকে আর ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর, সেই সময় সুদূর সুইডেন্ থেকে বিচিত্র পথ ধ'রে তিনি এসে পড়েছিলেন মেসোপোতেমিয়ায়,—এবং সেখান থেকে পারস্যে। পঁচিশ বছর বয়সে পারস্য সম্রাটের কাছে উপস্থিত হন। সেই সূত্রেই মধ্য-এসিয়ার পথঘাটের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে এবং তার আবাল্যের স্বপ্ন খোরাসান, তুর্কীস্থান এবং হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের পথরেখা তিনি তাঁর জাগ্রত চোখে দেখতে পান।

হেডিন্ অনেকের নিষেধ সত্ত্বেও দুঃসাহসিক ভ্রমণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর বয়স যখন তিরিশ, তখন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ এসিয়া-ভ্রমণ আরম্ভ হয়। তিনি আরল্ সমুদ্র পেরিয়ে তুর্কীস্থানের ভিতর দিয়ে খাসগড়ের দিকে অগ্রসর হন। এর আগে এতবড় বিশাল মরুভূমি

আর কেউ অতিক্রম করেননি। তারপর হেডিন্ মোস্তাগ-গিরিপথের মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্য অগ্রসর হন, এবং সেই দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন ক'রে তিনি ছদ্মবেশে তিব্বত অতিক্রম করেন। সেখান থেকে সহস্র বাধা ও বিপদের ভয় তুচ্ছ ক'রে, পদে পদে বিপন্ন জীবনকে রক্ষা ক'রে তিনি চ'লে যান চীনদেশের পূর্বপ্রান্তবর্ত্তী নগর পিকিঙে। তাঁর বীরত্বের জন্য তিনি যে কেবল খ্যাতিলাভ করেছেন তাই নয়, তাঁর আনুপূর্ব্বিক সংবাদ-সংগ্রহ-বুদ্ধির অপূর্ব্ব কলাকৌশল এবং নির্ভুল ও নিখুঁত মানচিত্র রচনার ক্ষমতা তাঁকে জগতের বিদ্বজ্জনসভায় স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশবিদেশের বড় বড় ভ্রমণবীর তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানায়।

বিস্ময়ের কথা এই, যেখানে যত বিপদ ও দুর্ভাবনা, যেখানে নিশ্চিত প্রাণভয় ও নিত্য উদ্বেগ—সেই দেশ এবং সেই পথ হেডিন্‌কে বার বার আকর্ষণ করত। মরুভূমিকে উত্তমরূপে জানবার এবং মরুভূমির বিশাল রুক্ষ পথের ভিতর থেকে অমূল্য তথ্য আহরণ করার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশী। সুতরাং তিনি অবর্ণনীয় এবং অসহনীয় উৎপীড়ন ও দুঃখবেদনা সহ্য ক'রে তারিম ও গোবি মরুভুমির ভিতরে বিচরণ করেন। তিব্বতকে তিনি কোনদিনই ভুলতে পারেননি,—তিব্বত তাঁকে বার বার আকর্ষণ ক'রে নিয়ে গেছে। একদা তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করেন। তুষারের ঝড়, শত্রুর আক্রমণ, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখব্যাদন, হিংস্র শ্বাপদের করাল চক্ষু, ভয়াবহ সরীসৃপের চক্রান্ত—হেডিন্ সাহেবের অভিযানকে কোথাও প্রতিহত করতে পারেনি। তবে তিব্বতের রাজধানী লাসার দিকে যাবার সময় তিনি যে বাধা পান, সেই বাধা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। লাসার দরজা থেকেই এক প্রকার তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ডাকাতের দল তাঁকে ঘেরাও করে, তিব্বতী লামার দল তাঁকে আক্রমণ করে। তাঁর জীবন চারদিক থেকে বিপন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তিনি না করেছেন অস্ত্রপ্রয়োগ, না করেছেন রক্তপাত। তাঁর স্বভাবের মাধুর্য ছিল অপূর্ব্ব। তিনি বহু ভাষা অনায়াসে বলতে পারতেন, মিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা বিরূপশক্তিকে বশ করতে পারতেন। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ, বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল তাঁর বড় প্রিয়। তাঁর সাহিত্য-প্রীতি ছিল প্রগাঢ়, ছবি আঁকতেন তিনি চমৎকার।

অনাবিষ্কৃত আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে গিয়ে দুর্বহ জীবন যাপন করেছেন কত বীর। কেউ মরেছেন, কেউ বেঁচে গিয়েছেন কোনো মতে। মধ্য আফ্রিকার অসংখ্য হ্রদের চারিদিকে কত বিভীষিকাময় অরণ্য, কত নরহত্যার শয়তানী চক্রান্ত, প্রকৃতির ভয়াবহ বিরূপতা, হিংস্র জানোয়ারের নিত্য আক্রমণ—কিন্তু বীরের দল তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। জোসেফ টম্‌সন; বয়েড আলেকজান্দার —এঁরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক। এঁরা আফ্রিকার অরণ্যে ঢুকেছেন, দুর্গম জনহীন পার্বত্যপথে গিয়েছেন, দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছেন, দস্যুর বিষাক্ত বর্শাফলকের আঘাত সহ্য ক'রেও বেঁচেছেন। জোসেফ টম্‌সন আফ্রিকায় গিয়েছেন বার বার—আফ্রিকা তাঁকে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে যেত। ভ্রমণ করেছেন তিনি নিঃসঙ্গ, ঘুরে বেড়িয়েছেন আবিষ্কারের দুঃসহ ক্ষুধা নিয়ে,—অবশেষে দীর্ঘকালব্যাপী রোগ-ভোগের পর পথের ধারে মুখ থুবড়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করতে বার হয়ে, কোনো কোনো বীরের এমনিতর শোচনীয় পরিণামই ঘটে।

বয়েড্ আলেকজান্দার বনেজঙ্গলে শিকার করতে ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন বিচিত্রবর্ণের পাখী সংগ্রহ করতে। তিনি গিয়েছিলেন পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকায়। পাখী-সংগ্রহের সূত্রে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন কতকগুলি দ্বীপ, এবং আরোহণ করেছিলেন ক্যামেরুন পর্বতমালার উচ্চতম শিখরে। অবশেষে এক নূতন পথে অভিযান করতে গিয়ে আলেকজান্দার এক জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। জনতা তাঁকে নিষ্ঠুরের মতো হত্যা করে।

কিন্তু প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় এই সব অভিযানকারীদের উদ্যম প্রতিহত হয়নি…এইটিই শিক্ষার বিষয়। অজানাকে জানবার, অনাবিষ্কৃত জীবনকে খুঁজে পাবার, অগম্যকে করতলগত করবার পিপাসা মানুষের সহজাত। সাহারাকে শৃঙ্খলিত করবে, উত্তর ও দক্ষিণ মেরুলোকে রাজ্যপাট বসাবে, দুরারোহ ও দুর্গমকে জয় করবে, ভয়ভীষণা রুদ্রাণী প্রকৃতিকে বশীভূত করবে, রাক্ষস জাতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে, সুদূর আকাশপথে প্রভুত্বের দাবি জানাবে,—এর জন্য মানুষ নিত্য ক্রিয়াশীল।

এরই জন্য কর্ণেল ফসেট্ গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকায়, কত রহস্যলোকই সেখানে তিনি ভেদ করেছিলেন। নরওয়ের বিখ্যাত বীর নান্‌সেন ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। চির-তুষারাচ্ছন্ন গ্রীণল্যাণ্ড অতিক্রম ক'রে পৃথিবীকে তিনি বিস্মিত করেন। নান্‌সেন ছিলেন অধ্যাপক, ছিলেন উকীল—কিন্তু উত্তর মেরুলোক তাঁকে অস্থির ক'রে তুলত। সাইবেরিয়ার পথে পথে, বরফের ঝড়ে, গলিত তুষারের নিশ্চিত মৃত্যুভয়ের মাঝখানে নান্‌সেন ছুটে গিয়েছেন প্রাণ বিপন্ন ক'রে। অনেকে বলেন আধুনিক বীরদলের ইতিহাসে চরিত্রের দৃঢ়তায়,

পৌরুষে, যোগ্যতা ও শক্তিমত্তায়—নান্‌সেনের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন।

যাঁরা বীর, তাঁদের মৃত্যু নেই—একথাটি যুগে যুগে সত্য।

* এ কাহিনী পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা হয়ত অভিযানে উৎসাহ ও সাহস লাভ করতে পারে।

অনুশীলনী

১। দুঃসাহসিক অভিযানকারীদিগের কাহিনী শোনার জন্য মানুষের কৌতূহল কেন?

২। হেডিন্ কে ছিলেন? কোন্ অভিযানের জন্য তিনি বিখ্যাত

৩। তিব্বতের রাজধানী কোথায়?

৪। পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে অভিযান ও আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হইয়াছে কি কারণে, তাহা লেখ।

[illegible] হেডিন, [illegible], [illegible] প্রভৃতি দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের

উনিশশো তিরিশ সাল



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—"বন্দে মাতরম্"—

—"মহাত্মা গান্ধীকি জয়"—

উত্তরাপথের গিরিদুর্গ আর দক্ষিণের নীলসমুদ্র উন্মথিত ক'রে উচ্চারিত হল সংকল্পবাক্য :

"আজ আমরা সংকল্প লইতেছি, ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা নিরস্ত হইব না। কিন্তু এই স্বাধীনতা আনিতে হইবে সত্যাগ্রহের ভিতর দিয়া, পরিপূর্ণ অহিংসার সহায়তায়। আমরা বিদেশী বয়কট্ করিব, আত্মঘাতী মাদকদ্রব্য বর্জন করিব, অন্যায় লবণ-করকে অস্বীকার করিয়া স্বহস্তে লবণ তৈরি করিব—"

মহাত্মা গান্ধী। দিকে দিকে রুদ্রধ্বনিতে বাজতে লাগল ওই একটি নাম। যাত্রা করলেন বে-আইনী লবণ সত্যাগ্রহের নির্ভীক

অভিযানে। সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ স্পর্ধার উত্তরে শান্তকণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন: "মেরা এক কদমসে সারে হিন্দোস্তান উথাল-পাথাল হো যায়গা—"

ওই একটি কথার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চক্ষের পলকে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—দাবানল জ্বলল পঞ্জাব-সিন্ধু থেকে উৎকল-বঙ্গ পর্যন্ত, আগুন ধরল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের বুকের পাঁজরে। হিন্দুস্থান উথাল-পাথাল হয়ে উঠল।

উনিশ শো তিরিশ সাল।

সেদিন কি ভুলবার দিন। ঘরে ঘরে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ পতাকা, পড়শীর ঘর ঘর মুখর হয়ে উঠল চরকার ঘর্ঘরে, হাতে হাতে ঘুরতে লাগল তকলি। স্বাবলম্বী হও—নিজেদের হাতে মিটিয়ে নাও নিজের প্রয়োজন, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় দেবতার প্রসাদী ফুলের মতো হাসিমুখে মাথায় তুলে নাও। কণ্ঠরোধ ক'রে দাও লাঙ্কাশায়ার আর ম্যাঞ্চেস্টারের, অবসান ঘটিয়ে দাও শৌখীন বিলাতী পরমুখাপেক্ষিতার। অপমানে লজ্জায় জর্জরিত পরের সজ্জা দূর ক'রে দিয়ে দেশমাতার দেওয়া উত্তরীয় উষ্ণীষ প'রে শুচি হও, কৃতার্থ হয়ে ওঠ।

রাস্তার মোড়ে বিলাতী কাপড়ের স্তূপ পুড়ছে। সিগারেটের প্যাকেট পর্বতের আকারে জড় করে তাতে আগুন ধরান হয়েছে; দেশী বিলাতী মদের বোতল চুরমার হয়ে গড়াচ্ছে রাস্তায়।

কি আশ্চর্য দিন—কি অপূর্ব সেদিকার উন্মাদনা।

ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল ইস্কুল-কলেজ থেকে, উকিল মোক্তারেরা বেরিয়ে এলেন আদালতের মোহ কাটিয়ে। ভয় নেই, দ্বিধা নেই, সংশয় নেই। স্বাধীনতা হীনতায় কেউ বেঁচে থাকতে চায় না।

এখন উর্ধ্বগগনে মাদল বেজেছে, নীচে ডাক দিয়েছে উতলা ধরণী, অরুণ প্রাতের তরুণদলকে আর অপেক্ষা করলে চলবে না, বেরিয়ে পড়তে হবে। ডাক দিয়ে বলতে হবে, "ঝাণ্ডা উঁচে রহে হামারা—"

সমস্ত দেশ, সমস্ত মানুষকে সেদিন পাগল ক'রে দিয়েছিল নবজীবনের উন্মাদ ছন্দ। কোন নির্লজ্জ এক ধূমপায়ী মুসলমান বিড়িওয়ালার কাছে 'কাঁচি-মার্কা' সিগারেট চেয়েছিল, তেড়ে উত্তর এল : 'জুতি-মার্কা' হ্যায়, খাওগে ?' একখানা বিলাতী কাপড়ের ওপরে খদ্দরের পাঞ্জাবি চড়িয়ে কে যেন নাপিতের কাছে দাড়ি কামাতে গিয়েছিল। নাপিত তার আধখানা গাল কামিয়ে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় ক'রে দিল। স্টেশনের সামনে কুলী পর্যন্ত সাদা সাহেবের মাল তুলতে ঘৃণা বোধ করলে, "নেহি ছুঁয়েঙ্গে।"

সেদিন কেউ ঘরে থাকতে পারেনি।

উনিশ শো তিরিশ সালের স্পর্শমণির ছোঁয়া লেগে সোনা হয়ে গেছে অনেক আবর্জনা, মুছে গেছে অনেক গ্লানি, ধুয়ে নির্মল হয়ে গেছে যুগসঞ্চিত অনেক অপরাধের অপবাদ। রেল স্টেশনের কুলী থেকে মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড় পর্যন্ত কেউ বাদ নেই আর। 'বন্দে মাতরমে'র বীজ মন্ত্র মুখের থেকে বুকে গিয়ে জমাট বেঁধেছে। গলা টিপে মুখকে তুমি বন্ধ করতে পার, কিন্তু বুকের এই রক্তাক্ত মর্মলিপিকে মুছবে কে ?

চারিদিকের রৌদ্র, গাছপালা, পথ, বাড়ী-ঘর কোন কিছুর আজ যেন আলাদা কোন রূপ নেই, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই কোন রকমের, আজ সমস্ত কিছু এক রকম হয়ে গেছে—ধরেছে একটি রঙ্—ত্রিবর্ণ পতাকার

রঙ্। আজ আকাশে বাতাসে ঝিম্ ঝিম্ রিম্ রিম্ ক'রে একটা গম্ভীর মধুর সুরের রেশ নিয়তই ঝঙ্কৃত হচ্ছে: 'বন্দে মাতরম্'— 'বন্দে মাতরম্'!

* স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য দ অনমনীয় সংকল্প এবং ঐক্যবদ্ধ প্র এই নির্দেশই এই রচনা থেকে পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

১। উনিশ শো তিরিশ সালে যে সংকল্পবাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল তাহা কি?

২। উনিশ শো তিরিশ সালটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কেন তাহা বল।

রচনাটিতে ১৯৩০ সালের অহিং অসহযোগ এবং সত্যাগ্রহের দ্বারা গঠিত জা ঐক্যের [illegible] হয়েছে। *

পরাধীন দেশের বীর বিদ্রোহী সূর্য সেন



ধীরেন্দ্রলাল ধর

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী। বন্দী-কক্ষ থেকে দুজন যুবককে সান্ত্রীরা ফাঁসীর মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, সহজ সাধারণভাবে নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে চলেছে প্রহার করতে করতে। নিরস্ত্র আসন্ন-মৃত্যু স্বাধীনতাকামীকে শেষ মূহূর্তের সম্মানটুকু দেবার মত সৌজন্য ইংরেজ মিলিটারীদের ছিল না।

বন্দী নায়ক চলেছেন আগে আগে, পিছনে তাঁর সহকর্মী।

নায়ক সাড়া তুললেন—বন্দেমাতরম্।

সমগ্র বন্দীশালা সচকিত হয়ে উঠলো, ঘরে ঘরে বন্দীরা শয্যার উপরে উঠে বসলেন, আবার তাঁদের কানে এসে বাজলো দলপতির অতি পরিচিত কণ্ঠের—বন্দে মাতরম্!

সমস্ত বন্দীশালা এবার প্রতিধ্বনি তুললো—বন্দে মাতরম্। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

কতটুকুই-বা পথ, ততক্ষণে বন্দী নায়ক ফাঁসীর মঞ্চে পৌঁছে বলতে শুরু করেছেন—হে আমার বন্ধুসমাজ, আজ আমি জন্মের মত তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি। মূহূর্ত পরেই আমার চোখের উপর থেকে জীবনের আলো নিভে যাবে, মৃত্যুর দূত সম্মুখে প্রস্তুত হয়েই আছে…

সান্ত্রীরা তাঁর গলা টিপে ধরলো।

কিন্তু সান্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে নায়ক আবার বলতে সুরু করলেন—চরম কথা আজ আমি বলে যাই—আমরা ভারতের, ভারতও আমাদের! যুগযুগান্তরের অত্যাচার-অনাচারে জাতির দেহ আজ ক্ষতবিক্ষত—জীর্ণ-শীর্ণ। প্রবলের মদ-মত্ততা, ধনিকের অর্থ-লালসা, শাসকের উৎপীড়ন, আভিজাত্যের অহঙ্কারের অবসান আমরা চাই। আজ দেশের সর্বত্র অত্যাচারী বৈদেশিক রাষ্ট্রের অজস্র পীড়নের নিদর্শন দেখছি। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ভগ্ন দেউলের দেয়ালে সহস্র রক্তলেখা—বিক্ষিপ্ত ধ্বংসস্তূপের উপর দুঃস্থ ও আর্তের ক্রন্দন …

আবার সান্ত্রী গলা টিপে ধরলো।

আবার কণ্ঠ মুক্ত করে নায়ক বললেন—তোমরা প্রথমে বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করবে, তারপর গণতন্ত্রের পথেই নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করবে এবং তখনিই আমাদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হবে। নিজেদের জীবনের মূল্যে লব্ধ স্বাধীনতা যেদিন আসবে, সেদিনই তোমাদের বিদ্রোহী নাম ঘুচবে, সেদিন তোমরা হবে রাষ্ট্রের সেবক, জাতির সেবক! রাষ্ট্র ও জাতিকে সর্বপ্রকার অশুভ পরিচালনা থেকে রক্ষা করাই হবে তোমাদের জীবন-ব্রত।

আবার সান্ত্রী গলা টিপে ধরলো।

কণ্ঠ মুক্ত হলে আবার নায়কের বাণী শোনা গেল—নিজেদের সংহতিকে সুদৃঢ় রেখে এই দেশের মুক্তি ও কল্যাণকেই সব-কিছুর উপর

স্থান দেবে। তোমাদের জন্য আমার একটি মাত্র কথা আছে।—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও,! তোমাদের শেষ ব্যক্তির শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত যেন আমাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিঃশেষিত হয়। সু-উচ্চ আদর্শ ও দুর্জয় একতা তোমাদের যাত্রাপথকে উজ্জ্বল করুক। আমরা—যারা জন্মের মত চললাম, তাদের শুভেচ্ছা তোমাদেরকে বর্মের মত ঘিরে থাকবে। আমরা কেউই মরবো না, জাতির সেবকের বুকে আমরা চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকবো। বল ভাই সব—বন্দে মাতরম্!

পাষাণপুরীর কক্ষে কক্ষে তখন নায়কের শত শত অনুগামী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, ক্ষুব্ধকণ্ঠে তাঁরা সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন—বন্দে মাতরম্! মাস্টারদা, ফুটুদা জিন্দাবাদ।

সমগ্র জেলখানা কেঁপে উঠলো তাদের কণ্ঠে।

সেই মহামন্ত্রের মাঝে ফাঁসীর মঞ্চে দুই বিশিষ্ট কর্মী ধরণীকে শেষ প্রণতি জানালেন।

কে জান এই মাস্টারদা? চট্টগ্রাম গণতন্ত্রী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন, আর তাঁর অনুগামী ফুটুদার ভাল নাম তারকেশ্বর দস্তিদার। এঁরা আজ নেই, কিন্তু এঁদের ঐতিহ্য ভারতের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করে গেছে।

পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী, তোমাদের প্রণাম করি।

অনুশীলনী

১। মাস্টারদা কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি?

২। 'ফুটুদা' কে? তাঁহার নাম কি ছিল?

৩। ফাঁসীর মঞ্চের দিকে যাইতে যাইতেও মাস্টারদার মধ্যে যে নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার বর্ণনা দাও।

আলোচ্য অংশে বিপ্লবী সূর্য সেন
...কে কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

পদ্যাংশ

নির্ভর

রজনীকান্ত সেন

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে,
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক, মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন ডুবে যাবে কোন্
অকুল গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণতলে নিয়ে এস মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া;

আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। ভগবানের কাছে কবির প্রার্থনা কি ?

৩। ভগবান কোথায় কোথায় রহিয়াছেন তাহার বর্ণনা দাও।

৪। ব্যাখ্যা কর—“আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া…দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।”

কবিতাটিতে কবি সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে অজ্ঞান [illegible] থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর দর্শনলাভের প্রার্থনা জানিয়েছেন।

ভারত-লক্ষ্মী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অয়ি ভুবন-মনো-মোহিনী।
অয়ি নির্মল-সূর্য-করোজ্জ্বল-ধরণি।
জনক-জননী জননি।
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল বিকম্পিত-শ্যাম-অঞ্চল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি।

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে ;
প্রথম-সামরব তব তপোবনে ;
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান, ধর্ম, কত পুণ্য-কাহিনী !
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য ;
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন ;
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্য-পীযূষ-স্তন্য বাহিনী !

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। ভারতবর্ষের মহিমা বর্ণনা কর। দেশপ্রেমমূলক ...
৩। অর্থ বল—'জনক-জননী-জননি।'

কবি এই কবিতার মধ্যে ভারতের তার গৌরবময় ঐশ্বর্যের দিক থেকে বিশ্বের জননী রূপে বন্দনা করেছেন।

বঙ্গ-জননী

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কে মা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিস্ বিরস মুখে ?
শিরে তোর নাগের ছাতা, কমল-মালা ঘুমায় বুকে !
ঢলঢল্ নয়নযুগল জলভরে পড়্ছে ঢুলে,
কাল মেঘে মিলিয়ে গেল তোর ওই নিবিড় কাল চুলে,
শিথিল মুঠি,—ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি ?
কে মা তুই কে মা শ্যামা—তুই কি মোদের বঙ্গভূমি ?

মা তোর ক্ষেতের ধান্যরাশি জাহাজ ভ'রে যায় বিদেশে,
অন্ন-সুধা বঙ্গে ফেরে গরল হ'য়ে সর্বনেশে।
বনের কাপাস বনে মিলায়, আমরা দেখি চেয়ে, চেয়ে
অন্নবসন বিহনে হায়, মরে তোমার ছেলে মেয়ে।
বল্ মা শ্যামা, শুধাই তোরে, মোদের এ ঘুম ভাঙ্‌বে নাকি ?
ধন্য হ'তে পারবো না মা তোমার মুখের হাসি দেখি ?

ত্রিশূল তুলে নে মা আবার রূপের জ্যোতি পরকাশি,
ভয় ভাবনা ভাসিয়ে দিয়ে হাস আবার তেম্‌নি হাসি।
চরণতলে সপ্ত কোটি সন্তানে তোর মাগে রে—
বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগে রে ;
সোনার কাঠি, রূপার কাঠি,—ছুঁইয়ে আবার দাও গো তুমি,
গৌরবিনী মূর্তি ধর—শ্যামাঙ্গিনী বঙ্গভূমি।

অনুশীলনী

১। বঙ্গ-জননীর রূপ ও গৌরব বর্ণনা কর।
২। বঙ্গ-জননীর কাছে কবির প্রার্থনা কি ?

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

জান না কি, জীব, তুমি, জননী জনমভূমি
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ?
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি-মুক্তা-হেম, স্বদেশের প্রিয়-প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর,
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

দেশের আচার মতে চল সত্য ধর্মপথে
সুখে কর জ্ঞান আলোচন ;
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

অনুশীলনী

১। স্বদেশের প্রতি মানুষের প্রবল আসক্তির কারণ কি ?
২। ব্যাখ্যা কর—"কতরূপ স্নেহ করি···ঠাকুর ফেলিয়া।"

ভারতের সমৃদ্ধি

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মোদের ভারতভূমি লক্ষ্মীর আবাস!
কত শস্য জন্মে হেথা বিহনে প্রয়াস॥
রসাল রসাল ফল কিবা তুল্য তার।
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
অপূর্ব সলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর ?
পানমাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর।
কিবা শস্য সুমধুর, আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ॥

আর এক ফল আছে নাম আনারস।
নন্দন কানন থেকে বুঝি আনা রস॥
নন্দন পতির ন্যায় সহস্র লোচন।
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন বরণ॥
শিরেতে পল্লবগুচ্ছ পুচ্ছের আকার।
হেমময় কিরীট কাননে অবতার॥
অপূর্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে জুটে মধুকরগণ॥
ঢাকা-কাশ্মীরের তন্ত্রের কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তূরী, মৃগমদ।
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিশদ॥
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চূয়া, পূগ আদি ফল॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এদেশে।
পূর্ব পয়োধির দ্বীপ-মালায় বিশেষে॥
সেই সব অপূর্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥
ভারতে না জন্মে যাহা না জন্মে জগতে।
জগতে সর্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥

অনুশীলনী

১। ভারতের সমৃদ্ধি বর্ণনা কর।

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার! জননী আমার!
ধাত্রি আমার! আমার দেশ!
কেন গো মা তোর শুষ্ক বদন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্তকোটি সন্তান যার
ডাকে উচ্চে—"আমার দেশ!"
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ
ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক—যাঁহার কীর্তি ছাইল
গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ,
তুই কি না মাগো তাঁদের জননী,
তুই কি না মাগো তাঁদের দেশ?

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—"আমার দেশ !"

একদা যাহার বিজয়-সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল-জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত
ভ্রমিল ভারত-সাগর-ময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-
জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন,
তার কি না এই ছিন্ন বেশ !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—"আমার দেশ !"
উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে
নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি,
চণ্ডীদাসও গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য ;
তুই ত না সেই ধন্য দেশ ?

ধন্য আমরা, যদি এ-শিরায়
থাকে তাঁদের রক্তলেশ।
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—"আমার দেশ।"
যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য,
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ !
দেবি আমার ! সাধনা আমার !
স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন—"আমার দেশ !"

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল। ২। বুদ্ধ কে ছিলেন ? তাঁহার খ্যাতি কিরূপ ? ৩। অশোক কেন বিখ্যাত ? ৪। "একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়"—অর্থ কি ? ৫। নিমাই কে ছিলেন ? ৬। প্রতাপাদিত্য কাহার সহিত যুদ্ধ করেন ?

কবিতাটিতে কবি জন্মভূমির পবিত্রতার

বাঙ্গালীর সঙ্গীত

চিত্তরঞ্জন দাস

আজি এ আলোকপূর্ণ সুন্দর আকাশ
গাহিছে আশার গীতি , পূর্ণ কর আশ ;—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস !

করহ সার্থক আজ সত্যেরে সাধিয়া,
দূর করি' হিংসা-দ্বেষ, বিদ্রূপ, বিলাস,—
এই মহামন্ত্র রাখি' বক্ষেতে বাঁধিয়া—
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস !

ওই হের, দেবতারা প্রসন্ন হইয়া
লিখেছে গগন-ভালে রবি-রশ্মি দিয়া—
বাঙ্গালী নহে গো ভীরু, নহে কাপুরুষ,
বাঙ্গালীর আছে আশা, আছে ইতিহাস !

দেবতা কহিছে কথা অন্তর ভরিয়া,
দেবতার বাক্যে আজ পূর্ণ কর মন,
আপন কর্মেরে চির হস্তে আঁকড়িয়া,
আপন ধর্মেরে কর বক্ষে আলিঙ্গন !

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল। ২। কবিতাটির মর্মার্থ ব্যক্ত কর।

কবিতাটিতে কবি দেশবাসীকে উৎ...

পল্লী-মা

গোলাম মোস্তাফা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চ'লে প্রবাস-পথে,
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে!

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন ক'রে দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে;
ভক্তি-পূজা দেইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্তি দেখে'!

স্নেহময়ীর রূপ ধ'রে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্ হ'তে ওই দিগন্তরে!
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখ্‌ছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে!

ওই যে মাঠে চড়ছে গরু লেজ দুলিয়ে মনের সুখে;
ওই যে পাখীর গানের সুরে কাঁপন লাগে বনের বুকে;
মাথাল মাথায়, কাস্তে হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু অশথ-মুলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ্‌ল দুলে;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে,
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে!

দুপুর-বেলার রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হ'য়ে কৃষক ভায়া
বস্‌ল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ ছায়া ;
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা,
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-করা মাঠের ছাতা !

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখ্‌লে চেয়ে
রঙীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে !
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে !

ওই যে লাউয়ের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষক-বালা আস্‌ছে ফিরে পুকুর হতে কলসী পূরে ;
ওই কুঁড়েঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে !

কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সে কথা মোর মনই জানে !
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা আর ছুটে নাকো মোহের পিছু !

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। বাঙ্‌লার পল্লী-সৌন্দর্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

কবিতাটিতে কবি পল্লী জীবনের সরলতা এবং পল্লী প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ...

মা আমার

কামিনী রায়

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার, কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি মা আমার, মা আমার!

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে;
ছোটখাটো সুখ দুখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার মা আমার

অতীতের কথা কহি' বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে আনিবার—
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার!

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার!

অনুশীলনী

১। কবিতার ভাবার্থ সংক্ষেপে বল।

জন্মভূমির দুঃখ মোচনের জন্য কবি

দেশের মাটি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামল বরণ কোমলমূর্তি
মর্মে গাঁথা॥

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা।

আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটান্থ দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

পল্লীরাণী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

জড়ানো শ্যাম শ্যাম-লতাতে নদী তীরের গুল্মগুলি
স্বচ্ছ তরল মুকুর পানে হর্ষে চেয়ে উঠ্ছে দুলি,
ওই যেথা ওই শশক চরে শঙ্কাবিহীন হৃষ্টমনে,
মিশ্ছে নদীর কলধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ;
ঝরা পাতার আসন পাতা, গাছটি ভরা মল্লিকাতে,
আস্ছে ভেসে ফুলের পরাগ শীতল শীকর-সিক্ত-বাতে,
প্রকৃতির ঐ নর্ম-গৃহে, শোভার প্রমোদ-ভবন-মাঝে,
মোদের রাণীর মৌনমুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে।
ওই যে বিশাল হর্ম্য ভাঙা, জঙ্গলেতে পূর্ণ বাড়ী,
চঞ্চলা তাঁর পেচক রাখি' অনেক দিবস গেছেন ছাড়ি ;
পড়ছে ঝরি চুণবালি সব, জীর্ণ কবাট বন্ধ থাকে,
ভগ্ন পূজার আঙিনাতে দিন দুপুরেই শৃগাল ডাকে ;
রুগ্ণ বালক-পৌত্র লয়ে' হোথায় থাকে একলা বুড়ী,
করবীর ওই ক্ষীণ শাখাতে একটি হের ফুলের কুঁড়ি ;

অতীত সুখের পাষাণ-লিপি ধরার মাঝে বড়ই দীনা,
ওই বাড়ীতে মোদের রাণীর বাজে করুণ মধুর বীণা !
শস্য শ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ-ছায়ে
পল্লীবাসীর ভক্ত রাখাল কতই গীতি নিত্য গাহে,—
কোন্ যুগে কোন্ অতীত দিনে মাঠে গেল ফসল মারা,
পঙ্গপালে শস্য সকল ক'রেই গেল ছন্নছাড়া !
কোন্ যুগে কোন্ জমিদারের মারা গেছে তনয় বুঝি,
রাখালগণের কণ্ঠগীতি আজো তারে বেড়ায় খুঁজি !'
অতীত দিনের ক্ষুদ্র কথা, দুঃখ সুখ ও কান্না হাসি,
মোদের রাণীর মৌন মুখের বীণার স্বরে উঠ্‌ছে ভাসি' !

ঠেলে রেখে কাজের বোঝা, বন্ধ ক'রে বইর পাতা
মায়ের বিজন মন্দিরেতে এসো, তোমায় ডাক্‌ছি ভ্রাতা।
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো বেগুনী ওই মস্‌নে ফুলে,
মেঠো ঝিঙার সতেজ লতা পড়্‌ছে ঝুলে নদীর কূলে ;
বেগুন-ক্ষেতের কুটির হতে মিঠা মেঠো আস্‌ছে গীতি,
নূতন আমের মঞ্জরীতে আন্‌ছে টেনে সুদূর স্মৃতি !
পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে পল্লীরাণীর স্নিগ্ধ ছবি
দেখতে সবায় ডাক্‌ছি আমি—এস ভাবুক-ভক্ত-কবি !

অনুশীলনী

১। পল্লী-বাংলার যে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখার জন্য কবি আহ্বান জানাইয়াছেন, সেই দৃশ্য সম্বন্ধে একটি অনুচ্ছেদ রচনা কর।

বাংলা পল্লী প্রকৃতির এই প্রাকৃতিক পটভূমিতে পল্লীমানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ ...

সঙ্কল্প

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বার্থ-অসির ঘাত-প্রতিঘাত দুঃখে-সুখে টল্‌ব না,
তোষামোদের নিশান হাতে আপনারে আর ছল্‌ব না।
স-পৌরুষে দল্‌ব পদে পরাজয়ের কল্পনা,
মঠে, মঠে লুটিয়ে মাথা নয়ন-জলে গল্‌ব না।
বিবেক-বারণ শুন্‌ব শুধু, গুরুর নিষেধ মান্‌ব না।
জীবন্মৃতের মন্ত্রে ভুলে কে র'বে আর আনমনা।
সত্য ন্যায়ের শাস্ত্র ছাড়া অন্য বিধান জান্‌ব না।
আকাশ কুসুম লক্ষ্য করে বাণের ফলা হানব না।
অভিমানীর সোনার প্রদীপ পূজার ঘরে জ্বাল্‌ব না।
রজস্তম ধূপ-ধূনা-ছাই কাজল-কালি ঢাল্‌ব না।
বলের সেরা ধ্যানের বলে অকুতোভয় দৃকপাতে।
ভরব আমার ধর্মশালা অমৃত রস-ভিক্ষাতে।

অনুশীলনী

১। জীবনে বৃহৎ হইতে গেলে কিরূপ সঙ্কল্প অন্তরে পোষণ করিতে হয় তাহা লেখ।

কবি স্বার্থ পরিচালিত না হয়ে [illegible] কোন প্রকার স্বার্থ [illegible] পৌরুষ ও সত্যের আদর্শে বাঁচতে চাই [illegible] সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন।

বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
(ওগো) তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা!

কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ঐ ভাষাতেই নিতাই-গোরা,
আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-ক্লান্তি-নাশা!
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন,
হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
ঐ ভাষারই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আন্‌ল মালা জগৎ জিনে;
তোমার চরণ-তীর্থে মাগো, জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে মা মা ব'লে
ঐ ভাষাতেই বল্‌ব হরি, সাঙ্গ হ'লে কাঁদা-হাসা॥

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষা আমাদের গর্বের জিনিস কেন, সংক্ষেপে তাহা লেখ।

২। এই কবিতায় কবি যে সকল মনীষীদের উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা কাহারা?

৩। 'বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌ল মালা জগৎ জিনে।' ইহার অর্থ বল।

কবিতাটিতে কবি বাংলা ভাষার
কীর্তি [illegible] বলেছেন যে এই ভাষাই আমাদের [illegible]

মাতৃভক্তি

কালিদাস রায়

নগর ও গ্রাম লুঠিয়া পাপীরা, রাজার তলবে জুটিল যবে
করে সুলতান দণ্ডবিধান, আনতমুণ্ডে দাঁড়ায়ে সবে।
মৃত্যু, নেত্রদহন, বেত্র, চিরকারাবাস ইত্যাকারে
শাস্তিপত্রী তাহাদের মাঝে বিলি করা হ'ল নির্বিচারে।
জীবনদণ্ড লভিল যে জন দাঁড়ায়ে কহিল জুড়িয়া পাণি—
মরিতে ডরি না, শুন নিবেদন একটি সকলে—চরম বাণী।
অন্ধ মায়ের এক ছেলে আমি, মা'র ভার যদি লও গো কেহ,
এই আশ্বাস-প্রবোধ পাইলে পারিব হেলায় ত্যজিতে দেহ।"
আসামী দলের উঠি' একজন তাহার পত্রী কাড়িয়া নিয়া
কহিল দাঁড়ায়ে আপন পত্রী তাহার হস্তে গুঁজিয়া দিয়া—
"আমার মায়ের পাঁচ সন্তান, তার মাঝে আমি অধম হীন,
আমি কুপুত্র, মায়ের মহিমা বুঝিনি জীবনে একটি দিন,
তোমার মতন মাতৃভক্ত মাতার সেবায় বাঁচিয়া রোক্,
কশার দণ্ড লও তুমি ভাই, জীবন দণ্ড আমার হোক্.

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মধ্যে মাতৃভক্তির যে নিদর্শন রহিয়াছে তাহা নিজের ভাষায় লেখ।

২। যে দুজন দণ্ডিত কথা বলিতেছে তাহার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি মনে কর ?

কালকেতুর ভোজন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

দূর হৈতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া॥
নারিকেল মালা ভরি' দিল তারে জল।
ঝাঁটী জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল॥
পা পাখালিয়া বীর জল দিল মুখে।
ভোজন করিতে বীর বসিল কৌতুকে॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটীর পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নতুন খাপরা॥
মুচড়িয়া গোঁফ দুটা বাঁধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে তিন হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ।
দধি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাইল বুনো ওল পোড়া।
বন পুঁই ভার দুই, কলমির ছড়া॥
ফুল্লরা রন্ধন ক'রে জ্বালে গোটা বাঁশ।
ঝোল রাঁধি' দিল দুটা হরিণের মাস॥
দশ গণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া।
সার কচুর ঘণ্ট খায় মিশায়্যা আমড়া॥
অম্বল খায়্যা বীর জায়ারে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করেছ ভাল, আর, কিছু আছে॥
আন্যাছি হরিণ এক, দিয়া দধি এক হাঁড়ি।
তাহা দিয়া খায় ভাত আর তিন হাঁড়ি॥

শয়ন কুৎসিত বীরের, ভোজন বিটকাল।
ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আঁঠিয়া তাল ॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
হরীতকী খাইয়া কৈল মুখের শোধন ॥

দুরূহ শব্দ ও বাক্যের অর্থঃ হরিণের ছড়া—হরিণের চামড়া। ঝাঁটি জল—ভোজনের স্থল—ঝাঁট দিয়ে ও জল ছিটিয়ে আহারের জায়গা তৈরী করল। পা পাখালিয়া—পা ধুয়ে। মাটির পাথরা—মাটির থাল খাপরা—টালির আকারের মাটির টুকরা। মুচড়িয়া গোঁফ দুটা ঘাড়ে··· কালকেতুর গোঁফ দুটা খুব বড় ছিল। পাছে সেই গোঁফজোড় খাবার জিনিসের উপর পড়ে, এইজন্য সেই গোঁফজোড়া সে খাবার সময়ে পিছন দিকে বেঁধে রাখে। কলমির ছড়া—কলমি শাকের গোছা (গুচ্ছ)। গোটা বাঁশ—আস্ত বাঁশ। মাস—মাংস। মিশায়্যা—মিশিয়ে। খায়্যা—খেয়ে। জায়ারে—স্ত্রী ফুল্লরাকে। জিজ্ঞাসে—জিজ্ঞাসা করে। আন্যাছি—এনেছি। দিয়া দধি এক হাঁড়ি—এক হাঁড়ি দইয়ের বদলে (ফুল্লরা একটি হরিণ এনেছে সেই কথা বলছে)। বিটকাল—বিশ্রী। তে আঁঠিয়া তাল—তিন আঁঠি বিশিষ্ট তাল—খুব বড় আকারের তাল। কৈল—করল। আচমন—আঁচানো, মুখ ধোয়া।

অনুশীলনী

১। ফুল্লরা বীর কালকেতুকে কিসের উপর বসিতে দিয়া খাইতে দিয়াছিল তাহা বল।

২। কালকেতুর ভোজন বর্ণণা কর।

৩। কালকেতু খাদ্যের যে গ্রাস তোলে, তাহা কিসের সঙ্গে তুলনীয়?

গ্রন্থপীঠ